The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.217- 224)
Published in October, 2025

কিংবদন্তি পীর বদর শাহ ও তাঁর সমাধি; পর্যালোচনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

সৈয়দ মুহাম্মদ মুনতাছির মোহাইমেন *

প্রতিপাদ্যসার: বারো আউলিয়ার দেশ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশেষত ধর্মীয় ইতিহাসের সাথে এই বারোজন আউলিয়ার নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বলা হয়ে থাকে তাঁরা চট্টগ্রামে এসে ইসলাম প্রচার ও প্রসার করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বদরে আলম বা বদর শাহ আউলিয়া (রঃ)। কিংবদন্তি অনুযায়ী তিনি বর্তমান নগরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত চেরাগি পাহাড়ের চূড়ায় চেরাগ বা চাটি জ্বালিয়ে জ্বীন, ভূত-প্রেতদের বিতাড়িত করে জঙ্গলাবৃত চট্টগ্রামে বসতির সূচনা করেন। আর এই চাটি থেকে চাঁটগা; পরে বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লার নিকটে বক্সিরহাট এলাকায় বদর শাহের সমাধি অবস্থিত। তাঁর নামানুসারে বর্তমানে এই স্থান বদরপট্টি বা বদরপাতি নামে পরিচিত। সুলতানী আমলে নির্মিত এই স্থাপনা চট্টগ্রাম শহরের প্রাচীন স্থাপনা সমূহের অন্যতম। এমনকি এটিকে চট্টগ্রাম শহরের প্রাচীনতম সমাধি স্থাপনা হিসেবেও অনেকে মনে করে থাকেন। প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন সমাধি কমপ্লেক্সে অন্তর্ভুক্ত ছিল মূল সমাধি, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি চতুর্ভুজ আকৃতির প্রবেশপথ, এবং সমাধির উত্তরপাশে লাগোয়া একটি কূপ। সময়ের বিবর্তনে আগের প্রাচীর ও পশ্চিম দিকের প্রবেশপথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কূপটিও বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বারংবার সংস্কারের মাধ্যমে মূল সমাধির গাঁয়ে সিমেন্ট ও টাইলসের আবরণে মোড়ানো হলেও স্থাপনাটি এখনো পূর্বের সকল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যকে অপরিবর্তিত রেখে সগৌরবে টিকে আছে নগরীর প্রাণ কেন্দ্রে। সমাধির পশ্চিমপার্শ্বে দরজার সাথে লাগোয়া একটা শিলালিপি এবং তার নিচে নৌকার মত লম্বা একখণ্ড পাথর সংরক্ষিত আছে। কিংবদন্তি আছে তিনি এই পাথরে ভেসে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। চট্টগ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বদর শাহের এই সমাধি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে। এই অঞ্চলের সকল ধর্মের মানুষের নিকট বদর শাহ সমানভাবে জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী এই দরবারে জেয়ারত ও মানতের উদ্দেশ্যে জমায়েত হোন। চট্টগ্রামে সুলতানী আমলের বেশ কিছু স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেলেও তার খুব কম সংখ্যকই বর্তমানে টিকে আছে। অপরদিকে বদর শাহ এর পরিচয় নিয়ে কিংবদন্তি ও বিভিন্ন লিখিত উৎসের উপর ভিত্তি করে করে গবেষণা ও পর্যালোচনা থাকলেও তাঁর সমাধি স্থাপনা নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর সমাধি স্থাপনাটি নিয়ে পর্যালোচনা করলে তাঁর পরিচয় নির্ণয়ের পাশাপাশি সুলতানি আমলে চট্টগ্রামে স্থাপত্য ও এর বিকাশ সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে, যা হয়তো ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচনে সহায়ক হবে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। সমুদ্র তীরবর্তী এই নগরী প্রাচীন কাল থেকেই বন্দরের জন্য বিশ্ব বাণিজ্যে সুপরিচিত ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর রূপে পরিগণিত ছিল। এমনকি হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও পিপলির মর্যাদা চট্টগ্রামের চেয়ে তুলনায় কম ছিল (করিম ১)। প্রাচীনকাল

* প্রভাষক, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে আরব বণিকেরা সমুদ্র পথে বাণিজ্যে খুব তৎপর ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনকি ইউরোপের বণিকেরাও এশিয়ায় বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আরবদের সহযোগিতা নিত। অষ্টাম শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের সমুদ্রবক্ষে আরবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত এইসময়েই তাঁরা চট্টগ্রাম বন্দর পৌঁছান (আলম ৩১)। এই আরব মুসলিম ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম বন্দরে আগমনের পর এই অঞ্চলে তারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে। ফলে আরব ও চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের মাঝে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এই আরব বণিকদের সান্নিধ্যে এসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয়।

বদর শাহের পরিচিতি

আরব বণিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অঞ্চলে দরবেশ ও পীর আউলিয়ারা আগমন করে এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করার মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের শাসনামলে চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনাধীনে আসে। চট্টগ্রাম জয়ের পর এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অসংখ্য পীর দরবেশ আগমন করতে থাকেন। বদর শাহ আউলিয়া এই সময়েই চট্টগ্রামে এসেছেন বলে ধারণা করা হয় (আলম ৪৬)।

জনশ্রুতি অনুযায়ী এই সময় বারোজন আউলিয়া চট্টগ্রামে এসে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। যে কারণে চট্টগ্রামকে বারো আউলিয়ার দেশ বলা হয়। "বারো আউলিয়ার দেশ" এই অভিধাটি কখন থেকে প্রচলিত হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, মাহবুবুল আলমের মতে এটি চতুর্দশ শতাব্দী থেকে চলে আসছে (আলম ৯৯)। অপর দিকে আবদুল করিমের মতানুসারে তা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রচলিত (আলম ৬৪)। এই বারো জন আউলিয়ার পরিচয় নিয়েও বেশ কিছু মত পাওয়া যায়।

আবদুল করিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সংরক্ষিত একটি আরবী পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে ১২ জনের মধ্যে ১১ জনের নাম উদ্ধার করেছেন। যথা-

১. শাহ আইয়ূব
২. সুলতান বাজীদ (বায়েজিদ) বোস্তামি
৩. হাফেজ পীর রাহা
৪. পীর ময়দান[১]
৫. পীর রাহান
৬. পীর বুরহান
৭. শাহ দরয়িব
৮. শাহ সিরাজ-উদ-দিন
৯. শাহ শরফ -উদ -দিন
১০. কবিলিয়ান
১১. কদর খান গাজী (করিম ৬৬)

অপরদিকে কবি মোহাম্মদ খান (সপ্তদশ শতকের) তাঁর বংশলতিকায় বার আউলিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই "পুস্তক বাড় এ হেতু" গ্রন্থে বারো আউলিয়ার তিনজন মতান্তরে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়। যথা-

১. কদল খান গাজী
২. বদর আলম
৩. শায়খ শরফ-উদ-দীন

অপর দুইজন হলেন-

৪. মাহি আসোয়ার
৫. হাজী খলিল (করিম ৬৪-৬৫)

এছাড়াও মুহাম্মদ এনামুল হক "A History of Sufi-ism in Bengal" গ্রন্থে ১০ জনের (২৩৬) এবং মাহবুবুল আলম তাঁর " চট্টগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে ৯ জনের (আলম ৯৯-১০০) নাম উল্লেখ করেছেন, যেখানে বদর শাহের নাম উল্লিখিত রয়েছে।

মতানৈক্য থাকলেও বদর শাহকে প্রায় সকলেই বারো আউলিয়ার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এমনকি তাঁকে বারো আউলিয়ার মধ্য অগ্রজ ও শ্রেষ্ঠও মনে করা হয় (Haq ২৩৫)। বদর শাহের পরিচয় নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়না। তাঁর পরিচয় ও বর্ণনা মূলত কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। বদর শাহ (পীর বদরুদ্দীন বদরে আলম) মীরাটে জন্ম গ্রহণ করেন। উনি হযরত শাহ জালাল এর অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর ৩৬০ আউলিয়ারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদর শাহ তরফের রাজা আচক নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। পরবর্তীতে হাজী খলিলের (বারো আউলিয়ার অন্তর্ভূক্ত) সাথে চট্টগ্রামে আসেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন (আলম ৪৭, ৯৯)। তবে কবি মোহাম্মদ খানের বর্ণনায় উপরোক্ত কাহিনী সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর বিবরণ মতে কবির পূর্ব পুরুষ শাহ আছোয়ার হাজী খলিল পীরের সাথে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছালে কদল খান গাজী ও পীর বদর আলমের সাথে তাঁর দেখা হয় (করিম ৮১)। অর্থাৎ কবির ভাষ্য অনুযায়ী শাহ আছোয়ার ও হাজী খলিলের পূর্বেই বদর শাহ চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং কিংবদন্তি অনুযায়ী তিনিই চট্টগ্রাম শহরে প্রথম ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

বদর শাহের ইসলাম প্রচার ও তত্পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে চট্টগ্রামে বেশ কিছু চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সেকালে চট্টগ্রাম শহর ছিল জঙ্গলাবৃত ও দূর্গম। পাহাড়ি এই অঞ্চল জীন-পরীদের দখলে ছিল। বদর শাহ বঙ্গোপসাগর হয়ে কর্ণফুলি নদী পথে প্রকাণ্ড একটি পাথরে ভেসে চট্টগ্রাম শহরে আসেন। তিনি যেই স্থানে এসে থেমেছিলেন সেই স্থান এখন পাথর ঘাটা নামে পরিচিত, যা বদর শাহের সমাধি হতে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে অবস্থিত। তাঁর ঐ পাথর এখনো তাঁর সমাধিতে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি জীন-পরিদের প্রভাব থেকে চট্টগ্রামকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে পাহাড়ের চূড়ায় একটি চাঁটি (মাটির প্রদীপ) বা চেরাগ জ্বালানোর সপরিমাণ জায়গা চেয়ে নিয়ে চেরাগ জ্বালান। এই চেরাগের কিরণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা সমগ্র চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। জীন- পরীরা এই আলো সহ্য করতে না পেরে চট্টগ্রাম থাকে চিরতরে বিতারিত হয়। এরপর চট্টগ্রাম শহর মানব বসতির জন্য উপযোগী হয় এবং বদর শাহ এখান থেকেই ইসলাম প্রচার শুরু করেন (Haq ২৪৩-২৪৪, করিম ৮০-৮১; সাকলায়েন ১৩৪)। বদর শাহ যেস্থানে চেরাগ জ্বালিয়েছিলেন তা এখনো চেরাগী পাহাড় নামে পরিচিত এবং তাঁর চাঁটি থেকেই চাঁটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম নামটি এসেছে বলেও ধারণা করা হয়।

তাঁকে নিয়ে আরও একটি কাহিনী চট্টগ্রামে বেশ জনপ্রিয়। একবার তাঁর সাথে বারো আউলিয়ার অন্যতম শাহ মোহসেন আউলিয়ার সংঘাত হয় এবং তিনি তাঁকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেন। পরবর্তীতে তাঁর সেই ছুরি মাছে

রূপান্তরিত হয় এবং তিনি তা সমূদ্রে ছেড়ে দেন। যেটি স্থানীয়দের মাঝে ছুরি মাছ নামে পরিচিত। এখনো মানুষ মানত করে বেগুন দিয়ে ছুরি মাছ রান্না করে তাঁর সমাধীতে নিয়ে যায় এবং গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয় (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: ইসলাম)।

মাহবুবুল আলম পশ্চিমা কিছু গবেষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিহারের ছোট শরীফে সমাহিত পীর বদরের সাথে চট্টগ্রামের বদর শাহকে অভিন্ন মনে করেছেন। উক্ত গবেষকের মতে তিনি ১৪৪০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন (আলম ১০০)। যদিও মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম এই মতকে সমর্থন করেননি। তাঁরা দুইজনকে ভিন্ন ব্যক্তি বলেছেন এবং চট্টগ্রামের বদর শাহের সময়কাল বিহারের পীর বদরের প্রায় ১০০ বছর পূর্বের উল্লেখ করেছেন (Haq ২৫০; করিম ৮৯)। প্রতিবছর ২৯শে রমজান জাঁকজমকভাবে বদর শাহের বার্ষিক ওরশ পালন করা হয়।

সমাধি স্থাপত্য

চট্টগ্রাম মূল শহরে মধ্যযুগের যেই কয়েকটি স্থাপনা এখনো বিদ্যমান, বদর শাহের সমাধি সেগুলোর অন্যতম। তাঁর সমাধি চট্টগ্রাম শহরের প্রাণ কেন্দ্র আন্দরকিল্লার অদূরে লালদীঘির পূর্ব দিকে বক্সিরহাটের বদরপট্টিতে অবস্থিত। পূর্বে সমাধিসহ সমগ্র এলাকাটি আন্দরকিল্লার অন্তর্ভূক্ত ছিলো, যার প্রমাণ পাওয়া যায় মুঘল ঐতিহাসিক *শিহাব-উদ-দিন আহমদ তালিশ* এর *ফাতহীয়া-ই-ইবরিয়া* নামক গ্রন্থে। সপ্তদশ শতকের এই ঐতিহাসিক লিখেছেন,"দুর্গের মধ্যে একটি টিলার উপর পীর বদরের আস্তানা নামে একটি কবর আছে" (করিম ৮২) এখানে দুর্গ বলতে আন্দরকিল্লাকেই বুঝানো হয়েছে, যা ইতিপূর্বে মঘদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। শিহাব-উদ-দিনের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় মুঘলরা ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বেই সেখানে বদর শাহের সমাধি স্থাপিত হয়েছিল। বৈশিষ্ট্যগত ভাবে পর্যালোচনা করলেও এই স্থাপনা যে সুলতানী আমলে নির্মিত তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানে তাঁর সমাধির পশ্চিম ফাসাদে বিদ্যমান পাথরের শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করা গেলে তাঁর সঠিক সময়কাল ও পরিচয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হয়তো বিস্তারিত জানা যেত। কিন্তু অসচেতনভাবে বারংবার স্পর্শের কারণে শিলালিপির লিখাগুলো প্রায় মুছে গেছে।

চিত্র: ১ বদর শাহের সমাধির বর্তমান আবস্থা

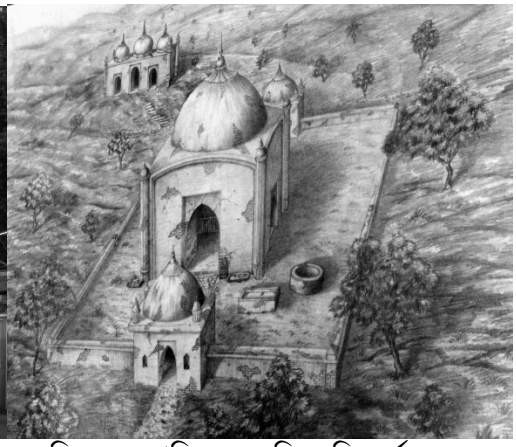

চিত্র: ২ সমাধিতে সংরক্ষিত চিত্রকর্ম

বাংলায় সুলতানী আমলের স্থাপত্য বিশেষত সমাধি স্থাপত্য সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্র ছিল। নির্মাণে সাধারণত ইট, পাথর, চুন, সুরকি ব্যবহার করা হতো। ১.৫ মিটার থেকে ৪.৫ মিটার পরিমাপের প্রশস্ত দেওয়াল, অষ্টাভূজাকৃতি ও গোল বুরুজের ব্যবহার, বাঁশ দিয়ে তৈরী কুড়ে ঘরের আদলে স্থাপনা নির্মাণ, ধনুকের মত বাঁকা কার্ণিশ, অনুত্থিত চ্যাপ্টা আকৃতির উল্টানো গম্বুজ, পেন্ডেন্টিভ ও স্কুইঞ্চের ব্যবহার, কৌনিক খিলানের ব্যবহার, তুলনামূলক ছোট দরজা , বর্গাকৃতির সমাধি গৃহ, প্রভৃতি সুলতানী স্থাপত্যকে অনন্য করেছে।

বদর শাহের সমাধি বহিঃদেয়াল বেষ্টিত প্রশস্ত এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এই কমপ্লেক্সে মূল সমাধি গৃহ, বহিঃদেয়ালের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুইটি প্রবেশপথ, সমাধির উত্তর পাশে লাগোয়া একটি কূপ অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে মূল গৃহ, পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ এবং কূপটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বহিঃদেয়াল ও পশ্চিম পাশের প্রবেশপথের কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। মূল সমাধি গৃহটি প্রায় বর্গাকারে নির্মিত। বারবার সংস্কার ও টাইলস লাগানোর কারণে এই সমাধির পরিমাপে তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বর্তমানে স্থাপনাটির যে পরিমাপ পাওয়া যায় তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধা থেকে যায়। উত্তর-দক্ষিণে ২৯ ফুট ২ ইঞ্চি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩০ ফুট ১০ ইঞ্চি আয়তনের এই সমাধির ভূমি থেকে কার্ণিশ পর্যন্ত উচ্চতা ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। এই গৃহের দেয়ালের পুরুত্ব ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। সুলতানী বাংলার অন্যান্য স্থাপনার মত এটির কার্নিশও ধনুকের মত বাঁকানো। যদিও বর্তমানে উত্তরোত্তর সংস্কারের ফলে বাঁকা কার্নিশ দৃশ্যমান নয়, তবে সমাধিতে সংরক্ষিত হাতে আঁকা সমাধির চিত্রকর্মে বাঁকা কার্নিশ দেখা যায়। তাছাড়া এর ছাদে উঠলেও ক্রমশ বাঁকা এই কার্নিশ দৃষ্টিগোচর হয়। সমাধির চার কোণায় চারটি অষ্টাভূজাকৃতির বুরুজ রয়েছে, যার পাঁচটি ভুজ বাইরে থেকে দৃশ্যমান। সাধাণত সুলতানী আমলের বুরুজ কার্নিশের উপরে উত্থিত না হলেও এই স্থাপনার বুরুজ কার্নিশ ভেদ করে উপরে উত্থিত এবং এর উপরে ফিনিয়াল যুক্ত কিউপলার ব্যবহার করা হয়েছে। উত্থিত বুরুজের উপর একই ধরণের কিউপোলার ব্যবহার বাগেরহাটের খান জাহান আলীর সমাধিতেও লক্ষ্য করা যায়। সমাধি গৃহের চার দেয়ালের ঠিক মাঝ বরাবর চারটি প্রবেশপথ রয়েছে। আয়াতকার প্যানেলে কৌণিক খিলান বিশিষ্ট এই প্রবেশপথসমূহ ৩ ফুট প্রশস্ত এবং এদের উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথগুলো খোলা থাকলেও উত্তর দিকের প্রবেশপথটি জালি দিয়ে বন্ধ করে জানালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলে মৃত দেহ উত্তর-দক্ষিণে কবর দেওয়ার নিয়ম থাকায় উত্তর পাশে কবরে মৃতের মাথার দিকের দরজাটি সম্ভবত সম্মানরক্ষার্থে বন্ধ করা হয়েছে।

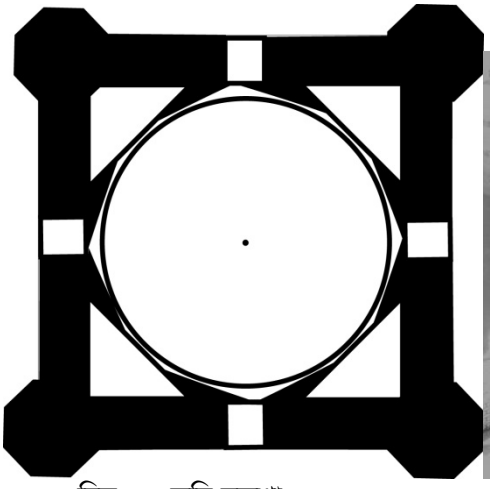

চিত্র: ৩ ভূমি নকশা

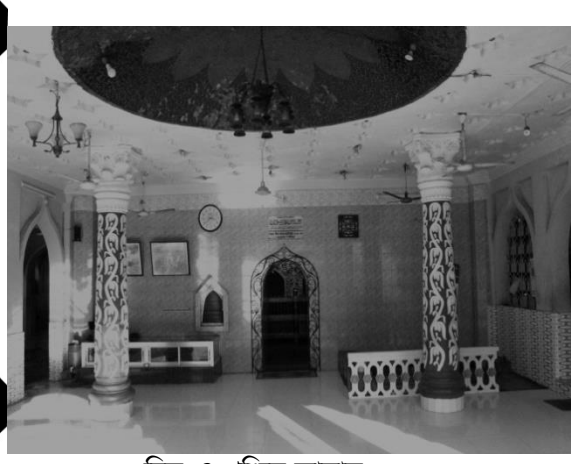

চিত্র: ৪ পশ্চিম ফাসাদ

সমাধি গৃহের অভ্যন্তর সম্পূর্ণ বর্গাকার। উত্তর দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৯ ইঞ্চি আর পূর্ব পশ্চিমে ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। সমাধির অভ্যন্তরের পরিমাপ এই সমাধি যে সুলতানী আমলের অন্যান্য সমাধি স্থাপত্যের মতই বর্গাকারে নির্মিত তাঁর নিশ্চয়তা দেয়। এই কক্ষের ঠিক মাঝখানে বদর শাহের কবর রয়েছে, যা বর্তমানে জালি ও ফুলেল নকশা করা তামার বেষ্টনি দ্বারা আয়াতাকারে ঘিরে রাখা আছে। বর্গাকার কক্ষের উপর গম্বুজ নির্মাণের জন্য বৃত্তাকার ক্ষেত্র তৈরী করতে স্কুইঞ্চ ও পেন্ডেনটিভের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে চার কোণায় চারটি গোলাকার খিলান যুক্ত স্কুইঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। এরপর জায়গাকে আরও সংকীর্ন করার জন্য স্কুইঞ্চের উভয় পাশে দুইটি করে সর্বমোট আটটি পেন্ডেনটিভ বানানো হয়েছে, ফলে ওখানে একটি প্রায় বৃত্তাকার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। এই বৃত্তাকার ক্ষেত্রটির উপর ড্রাম বিহিন সরাসরি একটি গোলাকার গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। ৭৯ ফুট পরিধির বৃহদাকৃতির গম্বুজটির চূড়ায় উল্টানো ফুলের নকশা করা, যার উপর থেকে ফিনিয়াল নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মূল ফিনিয়ালটি আর অক্ষত নেই, সেইস্থানে পিতলের তৈরি ফিনিয়াল স্থাপন করা হয়েছে। সমাধিতে সংরক্ষিত চিত্র থেকে দেখা যায় সেখানে একটি কলসের ব্যবহার করে ফিনিয়াল তৈরি করা হয়েছিল, যেইরূপ আমরা খান জাহান আলীর সমাধিতেও দেখতে পাই। ড্রামবিহিন বৃহদাকার একক গম্বুজ সুলতানী আমলের সমাধি স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; একলাখী সমাধি তার অন্যতম উদাহরণ।

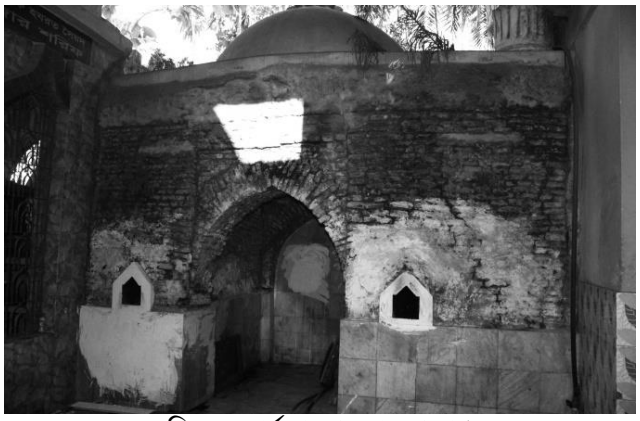

চিত্র: ৫ পূর্ব পাশের প্রবেশ পথ

সমাধি কমপ্লেক্সের পূর্ব পাশের ফটকটি এখনো প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। সমাধি গৃহের পূর্ব পাশের দরজার সমান্তরালে পূর্ব ফটকের অবস্থান। আয়াতাকৃতির এই ফটকের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট আর প্রস্থ ৯ ফুট ৮ ইঞ্চি। কার্ণিশ পর্যন্ত এটি ভূমি থেকে ৮ ফুট উঁচু। ফটকের কার্নিশ সমান্তরাল ভাবে তৈরি করা হয়েছে। আয়াতাকৃতির এই ফটক কক্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের খিলান পথের মাধ্যমে সমাধি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করা যেত। আয়াতাকার প্যানেলে আবদ্ধ গোলাকৃতি খিলানদ্বয়ের উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট আর প্রশস্ততা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। খিলানের উপরিভাগে পরপর দুইটি ইটের ব্যবহার করে দুইটি আবদ্ধ খিলানের সৃষ্টি হওয়ায় তা প্রবেশপথটিকে দৃষ্টিনন্দিত করেছে। ফটকের অভ্যন্তর বর্গাকারে তৈরী। যার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং গম্বুজ পর্যন্ত এর উচ্চতা ১২ ফুট প্রায়। বর্গাকার গৃহের চার কোণায় চারটি পেন্ডেনটিভের ব্যবহার করে একে বৃত্তাকার ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে গম্বুজ নির্মাণের সুবিধার্থে। যার উপর ড্রাম বিহিন গোলাকার গম্বুজ তৈরী করা হয়েছে। মূল সমাধি গৃহের মত ফটকেও উল্টানো ফুলের নকশার ব্যবহার করে তাঁর উপরে ফিনিয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ফটকের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করেছে এর

চার কোণে নির্মিত চারটি কিউপোলা। ফুলেল নকশাযুক্ত ভিতের উপর ছোট গোলাকৃতির কিউপোলা ফটকের নান্দনিকতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। খিলান দরজার উভয় পাশে ১৭.৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ১৬ ইঞ্চি প্রস্থ পরিমাপের কৌনিক খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। মূলত আলোক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই এগুলো নির্মাণ করা হতো।

সমাধি গৃহের উত্তর পাশে লাগোয়া কূপটিও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, যদিও প্রায় ৪ ফিট ব্যাসার্ধের কুয়াটি এখন আর ব্যবহার উপযোগী নয়।

পশ্চিম ফাসাদের দরজার উত্তর পাশে লাগানো শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় বদর শাহের সমাধির সঠিক সময় ও ইতিহাস জানা না গেলেও তাঁর সমাধির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলার সুলতানী আমলের অপরাপর স্থাপত্য সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে, এই সমাধিও যে সুলতানী আমলেই নির্মিত তা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমাধি নির্মাণে চ্যাপ্টা আয়াতাকার ইট, সুড়কি ও চুনের ব্যবহার, নির্মাণ কৌশল ও পদ্ধতি, স্থাপত্যের পরিমাপ, গঠনগত বৈশিষ্ট্য, ভূমি পরিকল্পনা প্রভৃতি সুলতানী বাংলার স্থাপত্যের সাথে অধিকাংশই মিলে যায়। বিশেষ করে সুলতানী বাংলার দুইটি বিখ্যাত সমাধি স্থাপনা জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহের একলাখী সমাধি ও খান জাহান আলীর সমাধির সাথে এই সমাধির সর্বাধিক সামঞ্জস্যই প্রমাণ করে উপরোক্ত সমাধিদ্বয়ের ন্যায় বদর শাহের সমাধিও সুলতানী আমলেই নির্মিত।

আল্লামা বদর শাহ চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর সমাধি চট্টগ্রাম শহরে এখন পর্যন্ত পাওয়া সর্বপ্রাচীন সমাধি স্থাপনা যা একদিকে যেমন চট্টগ্রামে সুলতানী আমলের নিদর্শন ও অস্তিত্ব প্রমাণ করে অন্যদিকে এটি চট্টগ্রাম শহরের উত্থান, বসতি ও নগরায়নের প্রাচীনতম ইতিহাস অনুসন্ধানেও সহায়তা করে। মাহবুবুল আলমসহ কয়েকজন বদর শাহকে বিহারের পীর বদরের সাথে অভিন্ন মনে করেছেন, যার মৃত্যু হয়েছে ১৪৪০ সালে (আলম ১০০), কিন্তু বদর শাহের সমাধি ও এর সাথে সমসাময়িক সমাধির সাদৃশ্যতা প্রমাণ করে এটি ১৪৪০ সালের আগেই নির্মিত। আর যেহেতু মৃত্যুর আগেই সমাধি নির্মাণ সম্ভব নয়, তাই চট্টগ্রামের বদর শাহ এবং বিহারের পীর বদর অভিন্ন ব্যক্তি হওয়াও অসম্ভব। অর্থাৎ তাঁর সমাধিই প্রমাণ করে দেয় বিহারের পীর বদর ও আল্লামা বদর শাহ ভিন্ন ব্যক্তি, যিনি নৌ পথে চট্টগ্রামে এসে কর্ণফুলীর নিকটে অবস্থান করেন এবং চট্টগ্রাম নগরে ইসলাম প্রচার ও প্রসার শুরু করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রামেই মৃত্যুবরণ করেন এবং এখানেই তাঁকে সমাধিত করা হয়।

উপসংহার

চট্টগ্রামের শুধু মুসলমান নয় বরং সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের মানুষের উপর বদর শাহের প্রভাব খুবই প্রবল। এখনো চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে মানত করতে বদর শাহের সমাধিতে ছুটে আসেন, চট্টগ্রামের মাঝি মাল্লারা দাঁড় টানার সময় আর সাগরের জেলেরা জাল তোলার সময় বদর শাহের গুণকীর্তন করতে থাকেন। এমনকি খেলোয়াড়েরাও হাডুডু খেলার ছন্দে বদর শাহের নামে ছড়া বেঁধে থাকেন। শহরের পাথরঘাটা, বদর পট্টি, চেরাগী মোড়, পরীর পাহাড় প্রভৃতি স্থানগুলোর নামকরণেরও বদর শাহ জড়িত এমনকি চট্টগ্রাম শহরের নামকরণেও তাঁর প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন। তাই চট্টগ্রাম নগরের ইতিহাস অনুসন্ধনে বদর শাহের নাম সর্বাগ্রেই থাকে। তাঁর সমাধিও সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চট্টগ্রাম শহরের বুকে।

টীকা

১. তাঁর নাম ২ বার উল্লেখ করেছেন, ফলে পাণ্ডুলিপিতে ১২ টি নাম থাকলেও মূলত ১১ জনের নাম পাওয়া গেছে।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

১. ইসলাম, মুহাম্মদ শহিদুল, খাদেম, বদর শাহের মাজার, বদর পট্টি, চট্টগ্রাম।

তথ্যসূত্র

আলম, মাহবুব উল,*চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানো আমল)*, চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৫০।

করিম, আবদুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭০।

গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১।

Haq, Muhammad Enamul, *A History of Sufi-ism in Bengal*, Dakha: Asiatic Society of Bangladesh, 1975.